بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৭ জুলাই, ২০২৩ মোতাবেক ০৭ ওয়াফা, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবায় মক্কার কাফেরদের ওপর মুসলমানদের প্রভাব-প্রতাপের কথা উল্লেখ করে আবু জাহল এবং উতবার যুদ্ধ সম্পর্কে মতবিরোধের উল্লেখ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আবু জাহলের খোঁটা দেয়ার কারণে উতবা যুদ্ধের ঘোষণা দেয় আর এভাবে রীতিমতো যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে লেখা হয়েছে যে, উতবা বিন রাবিআ তার ভাই শেবা বিন রাবিআ আর পুত্র ওয়ালীদ বিন উতবার মাঝে পায়ে হেঁটে বের হয় আর সারিগুলোর সামনে বেরিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানায়। হযরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, উতবা বিন রাবিআ এগিয়ে আসে আর পেছনে তার পুত্র এবং ভাই আসে আর সে উচ্চস্বরে ডেকে বলে যে, কে তার মোকাবিলায় আসবে? তখন আনসারদের কতিপয় যুবক এর উত্তর দেয়। সে আনসারদের জিজ্ঞেস করে যে, তোমরা কারা? তারা তার কাছে নিজেদের পরিচয় দেয়। উতবা তাদেরকে উত্তর দেয়, তোমাদের সাথে আমাদের কোনো কাজ নেই । আমরা আমাদের চাচাতো ভাইদের সাথে যুদ্ধের সংকল্প নিয়ে এসেছি। আমরা কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই, অর্থাৎ মক্কাবাসীদের সাথে, আনসারদের সাথে নয়। একইসাথে উচ্চস্বরে ডেকে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমাদের আত্মীয়দের মাঝ থেকে আমাদের সমপর্যায়ের লোকদের আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাঠাও। এতে মহানবী (সা.) বলেন, হে হামযা! উঠো, হে আলী! উঠো, হে উবায়দা বিন হারেস! উঠো। হযরত হামযা ছিলেন তাঁর (সা.) চাচা আর আলী এবং উবায়দা উভয়ে মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। হামযা উতবার দিকে অগ্রসর হন। হযরত আলী বলেন যে, আমি শেবার দিকে এগিয়ে যাই। উবায়দা এবং ওয়ালীদ পরস্পরকে আঘাত পাল্টা আঘাত করে আর উভয়েই একে অপরকে আহত করে দুর্বল করে দেয়। এরপর আমরা ওয়ালীদ-এর প্রতি মনোযোগী হই, তাকে হত্যা করে উবায়দাকে উঠিয়ে নিয়ে আসি। তারা উভয়েই অর্থাৎ হামযা এবং আলী তাদের প্রতিপক্ষকে (পূর্বেই) হত্যা করেছিলেন। হযরত হামযা এবং হযরত আলী যখন নিজ সাথী হযরত উবায়দা বিন হারেসকে পা-কাটা অবস্থায় উঠিয়ে মুসলিম বাহিনীর মাঝে নিয়ে আসেন, এরপর তাকে যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কি শহীদ নই? তিনি (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে তুমি শহীদ। হযরত উবায়দা যিনি মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন, এই আহত অবস্থা থেকে সেরে উঠতে পারেননি আর বদর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় পথে মৃত্যু বরণ করেন। হযরত উবায়দা বিন হারেস সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, যখন তার পা তরবারিতে কাটা পড়ে তখন তার সঙ্গীরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। তাকে নিয়ে আসার পর মহানবী (সা.)-এর কাছে শুইয়ে দেয়া হয়। মহানবী (সা.) নিজ পবিত্র পা তার নীচে রেখে দেন অর্থাৎ নিজের পা তার পায়ের নীচে রেখে দেন। উবায়দা একান্ত ভালোবাসার সাথে তাঁর (সা.) প্রতি তাকিয়ে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আজ যদি আবু তালেব জীবিত থাকতেন তাহলে

জানতে পারতেন যে, আমি তার কথার পরিপূরণস্থল হওয়ার অধিক যোগ্য। এরপর তিনি হযরত আবু তালেবের পঙক্তি পড়েন যার অর্থ হলো,

বায়তুল্লাহ্‌র কসম, তুমি মিথ্যা বলেছো যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করা হবে। তাঁর সুরক্ষার্থে আমরা এখনও বর্শাও চালাইনি আর তিরন্দাজিও করিনি। আর তুমি মিথ্যা বলেছো যে, আমরা তাঁকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো, যতক্ষণ না তাঁর চতুষ্পার্শ্বে আমাদের লাশ পড়ে আর আমরা আমাদের পুত্র ও কন্যাদের সম্পর্কে উদাসীন হবো। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি শহীদ।

এই উপলক্ষ্যে আবু জাহল একটি দোয়া করেছিল যার উল্লেখ এভাবে দেখা যায় যে, উভয় সেনাদল যখন পরস্পর মুখোমুখি হয়, অর্থাৎ প্রচণ্ড লড়াই আরম্ভ হয়, তখন আবু জাহল দোয়া করে যে, হে খোদা! আমাদের মাঝে যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে আর এমনসব কথা বলে যা আমরা পূর্বে কখনো শুনিনি আজ তাকে ধ্বংস করো।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে লিখেন যে,

বদরের যুদ্ধের সময় আমর বিন হিশাম নামের এক ব্যক্তি, যার নাম পরবর্তীতে আবু জাহল হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়, যে কুরাইশ কাফেরদের নেতা ও দলপতি ছিল, সে এভাবে দোয়া করে যে, **'আল্লাহুম্মা মান কানা মিন্না আফসাদা ফিল কওমে ওয়া আক্বতাআ লির্‌রাহমে ফাআহিনহুল ইয়াওম'**। অর্থাৎ, হে খোদা! আমাদের উভয়ের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি [(এই শব্দ দ্বারা সে নিজেকে ও মহানবী (সা.)-কে বুঝিয়েছিল)] তোমার দৃষ্টিতে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আর জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী হয় এবং জাতিগত অধিকার পদদলিত করে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করার কারণ হচ্ছে, আজ তুমি তাকে ধ্বংস করে দাও। এসব কথার মাধ্যমে আবু জাহল একথা বুঝতে চাচ্ছিল যে, নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.) একজন নৈরাজ্যবাদী মানুষ আর জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে কুরাইশদের মাঝে এক অন্যায় দলাদলি সৃষ্টি করছেন, অধিকন্তু তিনি সমস্ত অধিকার পদদলিত করেছেন আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ হয়েছেন। আবু জাহল এটিই বিশ্বাস করত বলে মনে হয় যে, নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর জীবন পূত-পবিত্র নয়, তবেই তো সে বিগলিত চিত্তে দোয়া করেছে। কিন্তু এই দোয়ার পর হয়ত এক ঘন্টাও জীবিত থাকতে পারেনি আর খোদার ক্রোধ সেই স্থানেই তার মস্তক ছিন্ন করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যার পবিত্র জীবনে সে কালিমা লেপন করতে চেয়েছিল তিনি এই ময়দান থেকে সাফল্য ও বিজয় নিয়ে ফিরে আসেন।

যুদ্ধের চিত্র এক স্থানে এভাবে অঙ্কন করা হয়েছে যে, যুদ্ধের ময়দানে তুমুল লড়াই চলছিল। মুসলমানদের সামনে তাদের চেয়ে তিনগুণ (বড়) সেনাদল ছিল যারা সকল প্রকার সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এই সংকল্প নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল যে, ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে বেচারা মুসলমানরা সংখ্যায় স্বল্প, যুদ্ধোপকরণে স্বল্প, দারিদ্র্য ও দেশান্তরের কষ্টে জর্জরিত, বাহ্যিক উপকরণের দিক থেকে মক্কাবাসীদের সামনে কয়েক মিনিটের শিকার ছিল। কিন্তু তৌহীদ ও রিসালতের ভালোবাসা তাদেরকে বিভোর করে রেখেছিল আর সেই জিনিস যার চেয়ে অধিক শক্তিশালী পৃথিবীতে আর কিছু নেই, অর্থাৎ জীবন্ত ঈমান তাদের মাঝে এক অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করেছিল। তারা তখন যুদ্ধের ময়দানে ধর্ম সেবার সেই আদর্শ উপস্থাপন করছিলেন যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল আর (তাদেরকে) খোদার পথে জীবন বিলিয়ে দিতে উদগ্রীব মনে হতো। হামযা ও আলী এবং যুবায়ের শত্রুদের সারির পর সারি ছিন্নভিন্ন করে দেন।

মুসলমানদের প্রথম শহীদ সম্পর্কে লেখা আছে যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব-এর

মুক্ত ক্রীতদাস হযরত মেহজাকে একটি তিরের নিশানা বানানো হয় যাতে তিনি শহীদ হন। তিনি মুসলমানদের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। এরপর বনী আদী বিন নাজ্জার গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত হারেসা বিন সুরাকা শাহাদত বরণ করেন। তিনি চৌবাচ্চা থেকে পানি পান করছিলেন এমতাবস্থায় তাকে লক্ষ্য করে একটি তির নিক্ষেপ করা হয় যা তার ঘাড়ে বিদ্ধ হয় আর এভাবেই তিনি শাহাদতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হারেসা (রা.) বিন সুরাকা বিন হারেস বদরের যুদ্ধে শহীদ হন আর তিনি সবেমাত্র যৌবনে পদার্পন করেছিলেন। তার মাতা হযরত আনাসের ফুপি, রুবাইয়্যা বিনতে নযর, মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! হারেসা (রা.)-এর যে মর্যাদা আমার দৃষ্টিতে ছিল তা আপনি জানেন। সে যদি জান্নাতে থাকে তাহলে আমি ধৈর্য ধরবো এবং পুণ্যের আশা রাখবো। যদি ভিন্ন কিছু হয়ে থাকে তাহলে আপনি দেখবেন যে, আমি কী করি। মহানবী (সা.) বলেন, পরিতাপ! তুমি কি উন্মাদ? জান্নাত কি একটিই? তিনি (সা.) বলেন, অনেক জান্নাত আছে এবং তোমার পুত্র তো জান্নাতুল্ ফিরদাউসে রয়েছে।

এই যুদ্ধে সাহাবীদের মাঝে জিহাদের যে উদ্দীপনা দেখা গেছে, সে সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আজ পুণ্য জ্ঞান করে ধৈর্যের সাথে যুদ্ধ করবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে না; আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। একথা শুনে বনী সালমা গোত্রের সদস্য উমায়ের বিন হুমাম (রা.), যিনি তখন খেজুর খাচ্ছিলেন, তার হাতে তখন কয়েকটি খেজুর ছিল, বলেন, বাহ্ বাহ্! আমার এবং জান্নাতের মাঝে কেবল এতটুকুই ব্যবধান? অর্থাৎ এরা আমাকে হত্যা করতে যতটা সময় লাগে কেবল ততটা? এরপর তিনি নিজের তরবারি হাতে নিয়ে প্রচণ্ড রণে ঝাপ দেন আর শহীদ হয়ে যান।

আফরার পুত্র ছিলেন অওফ বিন হারেস (রা.)। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার কোন্ কাজে খুশি হন? তিনি (সা.) বলেন, বর্ম ও যুদ্ধের পোশাকবিহীন অবস্থায় শত্রুকে হত্যা করাতে। তখন তিনি (রা.) তার বর্ম খুলে ফেলে দেন এবং অনেক কাফেরকে হত্যা করার পর নিজেও শহীদ হয়ে যান।

আবু জাহলের নিহত হওয়া সম্পর্কে বুখারীতে যে রেওয়ায়েত রয়েছে সে অনুযায়ী হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি বদরের যুদ্ধের দিন সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি দৃষ্টিপাত করে দেখি আমার ডানে ও বামে দু'জন অল্প বয়স্ক যুবক (দাঁড়িয়ে) আছে। তাদের উপস্থিতিতে আমি নিজেকে যেন নিরাপদ ভাবতে পারিনি। অর্থাৎ এরা হলো দুজন বালক বা কিশোর, এরা কীভাবে আমার সুরক্ষা করবে? তাই আমি (নিজেকে) নিরাপদ মনে করিনি। এরই মধ্যে তাদের মধ্য হতে একজন চুপি চুপি আমাকে জিজ্ঞেস করে, (যেন তার অন্য সঙ্গী জানতে না পারে যে,) চাচা! আমাকে আবু জাহলকে দেখিয়ে দিন? আমি বললাম, হে আমার ভাতিজা তার সাথে তোমার কি কাজ? সে বলে, আমি আল্লাহ্‌র সাথে এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমি যদি পাই তাহলে তাকে হত্যা করবো অথবা তার সামনে নিজেই মারা যাবো। এরপর অন্য কিশোর চুপি চুপি একই কথা জিজ্ঞেস করে, যা তার অন্য সাথী জানতে পারেনি। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) পরে বলতেন, আমি যদি দু'জন শক্ত সমর্থ পুরুষের মাঝে থাকতাম তাহলে এতটা আনন্দিত হতাম না। প্রথমে কিন্তু তাদের এই উদ্দীপনা সত্ত্বেও তিনি (রা.) আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না। (প্রথমে) তিনি তার ডানে বামে দু'জন শক্ত সমর্থ মানুষ আশা করছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি

তাদের দু'জনকে আবু জাহলের প্রতি ইশারা করে বলি, ঐ হলো (আবু জাহল)। একথা শোনামাত্রই তারা দু'জন বাজ পাখির মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে। তারা উভয়েই ছিল আফরার পুত্র মাআয এবং মুয়াওয়েয।

হযরত মাআজ বলেন, আমি লোকজনকে বলতে শুনি যে, আবুল হাকামের কাছে কেউ পৌঁছতে পারবে না। অতএব, আমি সংকল্পবদ্ধ হই যে, আমি অবশ্যই তার ওপর হামলা করবো। আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং তরবারির এক আঘাতে তার পায়ের গোছা পর্যন্ত কেটে ফেলি। তার ছেলে ইকরামা আমার কাধের ওপর আক্রমণ করে এবং আমার হাত কেটে ফেলে। হাতটি কেবল চামড়ার সাহায্যে আমার বাহুর সাথে ঝুলে ছিল। পুরো দিন সেভাবেই আমি যুদ্ধ করতে থাকি যখন বেশি কষ্ট হচ্ছিল তখন আমি এর ওপর পা রেখে সেটিকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি।

যুদ্ধ শেষ হলে মহানবী (সা.) নিহতদের মাঝে দাঁড়ান এবং আবু জাহলকে সন্ধান করা শুরু করেন। তিনি (সা.) তাকে খুঁজে না পেয়ে এই দোয়া করেন, **'আল্লাহুম্মা লা তু'জিযনি ফিরআউনা হাযিহিল উম্মাতে'**। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এই উম্মতের ফেরাউনের বিপরীতে ব্যর্থ কোরো না। সে যেন জীবিত পালাতে না পারে। এরপর লোকজন তাকে খুঁজতে শুরু করে এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) তাকে খুঁজে পান। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) দোয়া করেন, হে খোদা! এমন যেন না হয় যে, সে তোমার হাত হতে ফস্কে যাবে। মহানবী (সা.) যখন আবু জাহলের লাশ খুঁজে বের করার নির্দেশ প্রদান করেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) নিহতদের মধ্যে অনুসন্ধান করতে করতে তার কাছে আসেন। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, যদি তুমি তার সন্ধান না পাও তবে তার হাঁটুতে একটি আঘাতের চিহ্ন দেখে তাকে সনাক্ত করতে পারবে। কেননা একবার আব্দুল্লাহ্ বিন জুদ'আনের বাড়িতে একটি নিমন্ত্রণের সময় আমি তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়েছিলাম ফলে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় এবং তার হাঁটুতে আঘাত লাগে। সেই চিহ্ন এখনও তার হাঁটুতে বিদ্যমান। ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, সেই চিহ্নের মাধ্যমেই আমি তাকে চিনতে পারি এবং তখনও তার মাঝে কিছুটা প্রাণের স্পন্দন বাকি ছিল। আমি তার গলার ওপরে পা রাখি, কেননা মক্কায় সে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। আমি বলি, হে খোদার শত্রু! তুই কি দেখেছিস, খোদা তোকে কীভাবে লাঞ্ছিত করেছেন? সে বলে, কোন্ বিষয় আমাকে লাঞ্ছিত করেছে? একজন মানুষকে তোমরা হত্যা করেছো, এতে এমন কী হয়েছে! তোমরা কি আজ পর্যন্ত এমন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করেছো যে আমার চেয়ে অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান। ঠিক আছে, আগে বলো; কার বিজয় হয়েছে? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, আবু জাহল তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যখন কিনা আমি তার গলার ওপরে পা রেখেছিলাম তখন সে বলেছিল, হে সামান্য মেষ পালক! তুই এমন জায়গায় আরোহণ করেছিস যেখানে তোর আরোহণ করা উচিত হয় নি। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, এরপর আমি তার শিরোচ্ছেদ করি এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে এসে তাঁর (সা.)-এর চরণে নিক্ষেপ করি এবং নিবেদন করি যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এটি হলো খোদার শত্রু আবু জাহলের মস্তক। মহানবী (সা.) খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, **'আল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা গায়রুহু'**। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লাই সেই পবিত্র সত্তা যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। এটি ইবনে হিশামের রেওয়ায়েত।

আরেকটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) আবু জাহলকে হত্যা করার পর মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং আবু জাহলকে হত্যা

করা সম্পর্কে অবগত করেন। তখন মহানবী (সা.) তার সাথে পায়ে হেঁটে যান এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। আমিও নিবেদন করি, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। এরপর মহানবী (সা.) আবু জাহলের লাশের পাশে দাঁড়ান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই; যিনি তোকে লাঞ্ছিত করেছেন।

হযরত কাতাদাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক উম্মতেরই ফেরাউন রয়েছে। আর এই উম্মতের ফেরাউন হলো, আবু জাহল। আল্লাহ্ তা'লা তাকে মারাত্মকভাবে হত্যা করেছেন। আফরার দুই পুত্র এবং ফেরেশ্‌তারা তাকে হত্যা করেছে আর আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ তার ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন।

হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আবু জাহলকে ফেরাউন বলা হয়েছে। কিন্তু আমার মতে সে ফেরাউনের চেয়েও নিকৃষ্ট। ফেরাউন তো পরিশেষে বলেছিল, آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ। অর্থাৎ 'আমি ঈমান আনলাম যে, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যাঁর প্রতি বনী ইস্রাঈল ঈমান এনেছে (সূরা ইউনুস: ৯১)। কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত ঈমান আনেনি। মক্কায় সে-ই সকল নৈরাজ্যের হোতা ছিল আর চরম অহংকারী, আত্মম্ভরি আর মর্যাদা ও সম্মানের ভুখা ছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

মোটকথা মহানবী (সা.) হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় নিজ জাতির পুণ্যবান সদস্যদেরকে হিংস্র পশু ও রক্ত পিপাসুদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন আর মূসা (আ.)-এর ন্যায় তাদেরকে মক্কা থেকে মদিনায় বের করে এনেছেন আর আবু জাহল, যে এই উম্মতের ফেরাউন ছিল, তাকে বদরের যুদ্ধে ধ্বংস করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

বদরের যুদ্ধের সময় মক্কার কাফেররা যখন এলো তারা তখন ধরে নিল যে, বাস! আমরা তো এখন মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চলেছি। আর আবু জাহল বলে, আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করব এবং অনেক মদ পান করব আর পণ করল, আমরা মুসলমানদেরকে হত্যা করে তবেই ক্ষান্ত হবো। কিন্তু সেই আবু জাহলকেই মদিনার দুই বালক হত্যা করে [মক্কার কাফেররা মদিনাবাসীদের তুচ্ছজ্ঞান করত এবং তাদেরকে আরায়ী বলতো, অর্থাৎ সব্জি চাষী, কৃষীজীবি, যুদ্ধ সম্বন্ধে এরা কী জানে!]। মোটকথা সেই দুই বালক তাকে হত্যা করে আর তাকে এমন আক্ষেপের সাথে বিদায় নিতে হয় যে, তার অন্তিম ইচ্ছাটুকুও পূর্ণ হয়নি। আরবের রীতি ছিল, কোনো নেতা বা সর্দার যুদ্ধে নিহত হলে তার ঘাড় লম্বা করে কাটা হতো যেন চেনা যায় যে, সে একজন সর্দার ছিল। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) তাকে (তথা আবু জাহলকে) অসার হয়ে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, তোর অবস্থা কী? সে বলে, আমার অন্য কোনো দুঃখ নেই, দুঃখ কেবল এতটুকু যে, মদিনার দুজন আরায়ী (কৃষকের সন্তান) আমাকে হত্যা করল। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তোর কোনো অন্তিম ইচ্ছা আছে কী? সে বলল, আমি চাই, আমার ঘাড় একটু লম্বা করে কাটো। তিনি (রা.) বলেন, আমি তোর এই অন্তিম ইচ্ছাও পূর্ণ হতে দেবো না। একথা বলে তার গর্দান চিবুকের পাশ থেকে শক্ত হাতে কেটে ফেলেন। আর সে যে ঈদ উদ্‌যাপন করতে চাচ্ছিল তা তার মাতমের কারণ হয় আর সেই মদ যা সে ইতিপূর্বে পান করেছিল, সেটি হজম করার ভাগ্যও তার হয়নি।

মুশরেকদের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-এর কঙ্কর নিক্ষেপের ঘটনা সহীহ্ বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন তাঁবুতে দোয়া করছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) হাত ধরে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এখন ক্ষান্ত দিন। আপনি আপনার প্রভুর কাছে অনেক বেশি কাকুতিমিনতি করেছেন। মহানবী (সা.) বর্ম পরিহিত ছিলেন আর তাবু থেকে বের হতে হতে পাঠ করছিলেন, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ (সূরা ক্বামার: ৪৬-৪৭)। অর্থাৎ, অচিরেই এরা সকলে পরাজয় বরণ করবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে আর এটিই সেই মুহূর্ত যা সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছিল আর এ মুহূর্ত খুবই কঠিন এবং খুবই তিক্ত।

সীরাত খাতামান্নাবিয়্যিন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ. (রা.) এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন, বস্তুত মুহাজের হোক বা আনসার, সব মুসলমান মিলে পূর্ণ উদ্দ্যমে আন্তরিকতার সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য এবং তাদের সাজসরঞ্জামের আধিক্যের সামনে মুসলমানরা ছিল নিরুপায় আর একটা সময় পর্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল ছিল অনিশ্চিত। মহানবী (সা.) একাধারে দোয়া ও আহাজারি করছিলেন এবং তাঁর (সা.) উৎকণ্ঠা ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অবশেষে এক দীর্ঘ সময় পর তিনি সিজদা থেকে মাথা তোলেন এবং ঐশী সুসংবাদ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ বলতে বলতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসেন।

ইমাম রাযী সূরা আনফালের, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى (সূরা আনফাল-৪২) আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে বলেন, কুরাইশরা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন মহানবী (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! এই কুরাইশ গোত্র ঘোড়া ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সহ এমন দম্ভ নিয়ে এসেছে যে, তারা তামার রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং মিথ্যাবাদী আখ্যা দিচ্ছে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তা-ই চাচ্ছি যার বিষয়ে তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। তখন জিব্রাঈল (আ.) অবতীর্ণ হন এবং বলেন,

হে আল্লাহ্‌র রসূল! এক মুষ্টি মাটি নিন এবং এই কাফিরদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করুন। এরপর যখন উভয় সেনাদল পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, উপত্যকার কঙ্কর মিশ্রিত এক মুষ্টি মাটি দাও। তা তিনি সেসব কাফিরের চেহারা লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, **'শাহাতিল উজুহ্'** অর্থাৎ, চেহারা বিকৃত হয়ে যাক। তখন মুশরিকরা নিজেদের চোখ কচলাতে থাকে যার ফলে তারা পরাজিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى (সূরা আনফাল: ৪২)। অর্থাৎ, কঙ্কর মিশ্রিত মাটি, যেটি আপনি নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে আপনি নিক্ষেপ করেন নি। কেননা তাঁর নিক্ষেপ করা ততটুকুই প্রভাব বিস্তার করতে পারে যতটুকু একজন মানুষের নিক্ষেপ করা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। বরং আল্লাহ্ তা'লা সেটি নিক্ষেপ করেছেন যার ফলে এই মাটির কণাগুলো তাদের চোখ পর্যন্ত পৌঁছায়। বাহ্যত মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমেই কঙ্কর নিক্ষিপ্ত হয় কিন্তু এর ফলাফল আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই রণক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন,

তাঁবু থেকে বেরিয়ে তিনি (সা.) চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখেন রণক্ষেত্রে তুমুল লড়াই ও রক্তক্ষয় চলছে। সে সময়ে তিনি কঙ্কর ও বালু মিশ্রিত এক মুষ্টি মাটি উঠান এবং কাফিরদের

লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন এবং উচ্চস্বরে বলেন, **'শাহাতিল উজুহ্'**-শত্রুদের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। একইসাথে মুসলমানদের ডেকে বলেন, একযোগে আক্রমন করো। মুসলমানদের কর্ণকুহরে নিজেদের প্রিয় নেতার আওয়াজ পৌঁছতেই তারা নারায়ে তকবীর বলে একযোগে আক্রমন করে। অপরদিকে তাঁর একমুষ্টি কঙ্কর ছুঁড়তেই এমন ধুলিঝড় শুরু হয় যাতে কাফিরদের নাক, চোখ ও মুখ বালি ও পাথরের টুকরো দ্বারা ভরে যায়। তিনি (সা.) বলেন, এটা খোদার ফিরিশ্তাদের দল যারা আমাদের সাহায্যের জন্য এসেছে। রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে সে সময় কিছু লোক ফিরিশ্তাদের দেখেছে। যাহোক উতবা, শেবা এবং আবু জাহলের মতো কুরাইশ নেতারা তো ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের এই আকস্মিক ধাওয়া এবং ঝড়ের ঝাপটায় কুরাইশের পা উপড়ে যেতে থাকে এবং স্বল্প সময়ের ভেতর কাফিরদের বাহিনীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মাঝেই যুদ্ধক্ষেত্র ফাঁকা হয়ে যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'লেকা' (খোদা দর্শন)-এর এই পর্যায়ে কখনো কখনো মানুষের দ্বারা এমনসব অলৌকিক ঘটনা সাধিত হয় যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে বলে প্রতীয়মান হয় এবং ঐশী শক্তির বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে রাখে। যেভাবে আমাদের নেতা ও মনিব, শ্রেষ্ঠ রসূল হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) বদরর যুদ্ধে কঙ্করের এক মুষ্টি কাফিরদের ওপর নিক্ষেপ করেন এবং সেই মুষ্টি দোয়ার মাধ্যমে নয় বরং নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিবলে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সেই মুষ্টি ঐশী শক্তি প্রদর্শন করে এবং বিরোধী সেনাদলের ওপর এমন অলৌকিক প্রভাব পড়ে যে, তাদের মাঝে এমন কেউ ছিল না যার চোখে এর প্রভাব পড়ে নি। আর তারা সবাই অন্ধের মতো হয়ে যায়। এমন আতঙ্ক ও ভীতি তাদের মাঝে দেখা দেয় যে, তারা উন্মাদের ন্যায় পালাতে থাকে। এই অলৌকিক নিদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে বলেন, অর্থাৎ; যখন তুমি এক মুষ্টি পাথর নিক্ষেপ করেছ তখন তুমি তা নিক্ষেপ করো নি বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন। অর্থাৎ পর্দার অন্তরালে ঐশী শক্তি কার্যকর ছিল, মানবীয় শক্তির জন্য তা সম্ভব ছিল না।**

যাহোক কিছুক্ষণ পর মুশরিকদের মধ্যে ব্যর্থতা ও উদ্বেগের লক্ষণ স্পষ্ট হয়। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণে তাদের সারিগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাদের মাঝে আতঙ্ক দেখা দেয়। মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে পরাজিত করে। কাফিরদের বিরুদ্ধে হযরত সা'দ (রা.)'র তীব্র ভাবাবেগ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, শত্রুরা যখন পরাজিত হয়ে অস্ত্র সমর্পণ করে আর সাহাবীরা তাদের বন্দি করতে শুরু করে, তখন মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)'র চেহারায় অপছন্দের ছাপ দেখতে পান। অর্থাৎ মুসলমানদের এই কাজকে তিনি অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখছিলেন। তখন মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, হে সা'দ! মনে হচ্ছে তুমি মানুষের এই কাজ, অর্থাৎ মুশরিকদের আটক করাকে অপছন্দ করছ। তিনি (রা.) বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! মুশরিকদের সাথে এটাই আমাদের প্রথম ও সফল যুদ্ধ, তাই আমার মতে মুশরিকদের বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে যত বেশি সম্ভব হত্যা করাই শ্রেয়। তিনি (রা.) বলেন, আমি বন্দি করা অপছন্দ করছি, আমি চাই তাদের সবাইকে যেন হত্যা করা হয়।

বদরের যুদ্ধে ফিরিশ্তাদের অবতরণ সম্পর্কে লেখা আছে, আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (সূরা আনফাল: ১০)।

অর্থাৎ যখন তোমরা তোমাদের রবের সমীপে ফরিয়াদ করেছিলে তখন তিনি এই প্রতিশ্রুতি

দিয়ে তোমার দোয়া কবুল করেছিলেন যে, আমি অবশ্যই সারিবদ্ধ এক হাজার ফিরিশ্‌তা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব। হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও বদরের যুদ্ধে ফিরিশ্‌তাদের অবতরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) বলেন, ইনি হলেন জিব্রাঈল, তিনি তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছেন এবং সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত আছেন। সীরাত ইবনে হিশামের বেশ কয়েকজন সাহাবীর রেওয়ায়েত বদরের দিন ফিরিশ্‌তার অবতরণের বিষয়টি প্রমাণ করে। সাহাবীদের সম্পর্কে তার অনেকগুলো রেওয়ায়েত আছে। হযরত জিব্রাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে আপনি কী মর্যাদা দেন? তিনি (সা.) বলেন, সেরা মুসলিম অথবা এমনই অন্য কোনো কথা বলেছেন। তখন জিব্রাঈল বলেন, একইভাবে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফিরিশ্‌তারাও উত্তম। একজন জীবনীকার এ রেওয়ায়েতও লিখেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, বনু গাফ্‌ফারের এক ব্যক্তি আমার কাছে বলেছে, আমি এবং আমার এক চাচাতো ভাই এসে এমন একটি পাহাড়ে উঠলাম যেখান থেকে বদরের (যুদ্ধের) দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। আমরা মূর্তিপূজারী ছিলাম এবং যুদ্ধে কারা বিপর্যয়ের শিকার হয় তা (দেখার জন্য) অপেক্ষমান ছিলাম যাতে লুটপাটকারীদের সাথে আমরাও লুণ্ঠনে অংশ নিতে পারি। অতএব আমরা পাহাড়ে থাকা অবস্থায়ই এক টুকরো মেঘ আমাদের কাছে এলে আমরা তাতে ঘোড়ার হ্রেষা শুনতে পাই। আমি এক ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনেছি যে, **হ্যাযম**! (অর্থাৎ) এগিয়ে যাও। এ আওয়াজ শুনে আমার চাচাতো ভাইয়ের হৃদপিণ্ডের পর্দা ফেটে যায় আর সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। বাকি রইলাম আমি আর আমিও মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম কিন্তু পরে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করি। সুহায়েল বিন আমর তখন কাফির ছিলেন, তিনি বলেন, বদরের দিন আমি রংবেরঙের ঘোড়ায় আরোহিত সুভ্রপোশাকধারী লোকদের দেখেছি। তারা ছিল আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে দণ্ডায়মান আর তারা কুরাইশদের হত্যা করছিল ও বন্দি করছিল। মূল কথা হলো, বদরের দিন শুধু মুসলমানরাই ফিরিশ্‌তা দেখে নি বরং কাফিররাও দেখেছে।

আবু উসায়েদ মালিক বিন রবীয়্যা (রা.) বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তার একটি রেওয়ায়েত আছে। এ ঘটনাটি তার দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরের ঘটনা। তিনি ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন যে, আমি যদি আজ বদরের প্রান্তরে থাকতাম এবং আমার দৃষ্টিশক্তি থাকত তাহলে আমি তোমাদের সেই উপত্যকাটিও দেখাতাম (তিনি যখন ঘটনা বর্ণনা করছিলেন তখন তার দৃষ্টিশক্তি ছিল না) যেখান থেকে ফিরিশ্‌তা বের হয়েছে। আমার এতে কোনো সন্দেহ বা সংশয় নেই।

আবু দাউদ মা'যানীর রেওয়ায়েত রয়েছে, তিনি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আমি বদরের দিন এক মুশরিকের পিছু ধাওয়া করি তার ওপর আঘাত হানার জন্য। হঠাৎ আমি দেখি, আমার তরবারি তাকে স্পর্শ করার পূর্বেই তার মস্তক কাটা পড়ে। তখন আমি বুঝতে পারি, তাকে আমি নই বরং অন্য কেউ হত্যা করেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.)'র পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, বদরের দিন ফিরিশ্‌তাদের চিহ্ন ছিল শুভ্র পাগড়ি, সেগুলো শিমলা (অর্থাৎ পাগড়ির পেছন দিকের লম্বা কাপড়) পিঠের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং হুনায়নের দিন লাল পাগড়ি তাদের চিহ্ন ছিল। হযরত আলী (রা.)'র পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত হলো, পাগড়ি আরবদের মুকুটস্বরূপ আর বদরের দিন ফিরিশ্‌তাদের চিহ্ন ছিল সাদা পাগড়ি যার (পেছনের কাপড়) তারা পিঠের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছিল, কিন্তু হযরত জীব্রাঈল (আ.)'র মাথায় হলুদ পাগড়ি ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)'র রেওয়ায়েত হলো, ফিরিশ্‌তারা বদরের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধে লড়াই করে নি। অন্যান্য যুদ্ধে তারা সংখ্যা বৃদ্ধি ও সমর্থন জোগানোর উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করত, কিন্তু কাউকে আঘাত করত না। এটি সীরাত ইবনে হিশামের রেওয়ায়েত। কিছু লোকের ধারণা হলো, ফিরিশ্‌তার অবতরণ কেবল মু'মিনদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ এবং তাদের হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য ছিল অন্যথায় ফিরিশ্‌তারা কার্যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন সহীহ্ হাদীস পরিপন্থী। সহীহ্ রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত যে, ফিরিশ্‌তারা কার্যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সাহায্যের জন্য তো একজন ফিরিশ্‌তাই যথেষ্ট ছিল, তাহলে হাজার হাজার ফিরিশ্‌তা কেন অবতীর্ণ হলো? যুদ্ধের সময় ফিরিশ্‌তার অবতরণ সম্পর্কে সহীহাঈনে বিদ্যমান বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত করে ইমাম ইবনে কাসীর লিখেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফিরিশ্‌তার অবতরণ এবং এ সম্পর্কে মুসলমানদের অবগত করা সুসংবাদস্বরূপ ছিল অন্যথায় এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করতে পারেন। এজন্য তিনি বলেন, সাহায্য কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে এবং সূরা মুহাম্মদে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ চাইলে নিজেই কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারেন, কিন্তু তিনি পরীক্ষা করেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধে খোদা তা'লা মেঘমালা থেকে স্বীয় চেহারা প্রকাশ করেন, অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই বৃষ্টি হয় যার ফলে কাফিরদের চরম ক্ষতি হয় এবং যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে মু'মিনদের বিশাল উপকার হয়। আবার মু'মিনদের সাহায্য এবং কাফিরদের মাঝে ভীতি সঞ্চারের জন্য ফিরিশ্‌তারাও হৃদয়ে অবতরণ করেছে বরং বদরের যুদ্ধে বেশ কয়েকজন কাফির স্বচক্ষে ফিরিশ্‌তাদের দেখেছে এবং **কুযিয়াল আমরু** (অর্থাৎ বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে) আয়াত অনুযায়ী আরবের নেতাদেরকে বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে তফসীরে সগীরে, সূরা আলে ইমরানের ১২৭ নম্বর আয়াতের তফসীরি নোটে লেখা আছে, ফিরিশ্‌তাদের কথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ হলো, স্বপ্ন বা দিব্যদর্শনে সুসংবাদ লাভের ফলে মানুষের মনোবল বৃদ্ধি পায় নতুবা এর প্রকৃত অর্থ হলো, খোদা তা'লা সাহায্য করবেন। যাহোক, এটি একটি দিব্যদর্শনও হতে পারে বা বাস্তব চিত্রও হতে পারে যা মুসলমানরা এবং কাফিররা উভয়েই দেখেছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক 'আত্ তবলীগ' তথা আয়েনায়ে কামালাতে ইসলামে আরবীতে উল্লেখ করেছেন। আরবী বিভাগের কর্মীরা বলে, অনেক সময় আপনি দীর্ঘ উদ্ধৃতি পাঠ করেন তখন আমাদের জন্য অনুবাদ করা কঠিন হয়ে যায় তাই আমি মূল আরবীও পড়ে দেয়ার চেষ্টা করছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

و قد جرت عادته و سنته انه يختار الاخفا والكتم فى واقعات قضت حكمته اخفاها و يخلق الاهواء فتحشر الآراء الى جهات اخرى۔ و اذا اراد اخفاء صورة نفس واقعة ربما يرى فى تلك المواضع الواقعة الكبيرة صغيرة مهونة والواقعة الصغيرة المسنونة كبيرة نادرة والواقعة المبشرة مخوفة والواقعة المخوفة مبشرة۔ فهذه اربعة اقسام من الواقعات من سنن الله كما مضى۔ اما الواقعة الكبيرة العظيمة التى اراد الله ان يريها صغيرة حقيرة فنظيرها فى القرآن واقعة بدر لمن يتدبر و يرى۔ فان الله قلل اعدا الاسلام ببدر فى منام رسوله ليذهب الروع عن قلوب المسلمين و يقضى ما راد من القضا۔ و اما الواقعة التى اراد الله ان يريها

كبير نادرة فنظيرها فى القرآن بشارة مدد الملائكة كى تقر قلوب المؤمنين و لا تاخذهم خيفة فى ذالک الماوى۔ فانه تعالى وعد فى القرآن للمؤمنين و بشرهم بانه يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة و ما جعل هذا العدد الكثيرة الا لهم بشرى۔ لان فردا من الملائكة يقدر باذن ربه على ان يجعل عالى الارض سافلها فما كان حاجة الى خمس آلاف بل الى خمسة ولكن الله شاء ان يريهم نصرة عظيمة فاختار لفظا يفهم من ظاهره كثرة الممدين و اراد ما اراد من المعنى۔ ثم نباه المؤمنين بعد فتح بدر ان عدة الملائكة ما كانت محمولة على ظاهر الفاظها بل كانت ماولة بتاويل يعلمه الله بعلمه الرفع والاعلى۔ و فعل كذالک لتطمئن قلوبهم بهذه البشرى و يزيدهم حسن الظن والرجاء۔

এর অনুবাদ হলো, তাঁর এই রীতি ও সুন্নত আদীকাল হতে জারী আছে যে, তিনি সেসব ঘটনাকে সুপ্ত ও লুক্কায়িত রাখেন যেখানে প্রজ্ঞার দাবি হলো তা গোপন রাখা। মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এবং মতামত প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে থাকে। কখানো কখনো বড় ঘটনাকে ছোট এবং সাধারণ ঘটনা হিসাবে তুলে ধরে এবং ছোট ঘটনাকে বড় ও বিরল ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করে। একইভাবে সুসংবাদবাহী ঘটনাকে সতর্কবাণী এবং সতর্কবাণীকে সুসংবাদবাহী ঘটনা হিসাবে দেখিয়ে থাকে। এসব হলো ঘটনাবলীর চারটি ধরণ বা প্রকারভেদ যা আল্লাহ্‌র সুন্নত বা রীতি অনুসারে চলছে ও প্রবর্তিত আছে। সেই মহান ও বড় ঘটনা যেটিকে আল্লাহ্ ছোট ও তুচ্ছ ঘটনা আকারে প্রদর্শন করেছেন সেটি হলো বদরের ঘটনা, তার জন্য যে প্রণিধান ও অভিনিবেশ করে দেখতে চায়। অতএব আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধের সময় তাঁর রসূল (সা.)-এর স্বপ্নে ইসলামের শত্রু সংখ্যা কম করে দেখিয়েছেন যেন মুসলমানদের মন থেকে শত্রুভীতি দূর হয় আর আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা যেন অবশ্যই পূর্ণ হয়। আর সেই ঘটনা যেটিকে আল্লাহ্ বড় ও বিরল হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন এর দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান আর তা হলো, ফিরিশ্‌তাদ্বারা সাহায্য প্রদানের সুসংবাদ; যেন মু'মিনদের হৃদয় প্রশান্ত হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যেন কোনোরূপ ভয় না থাকে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মু'মিনদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং সুসংবাদ দিয়েছেন যে, পাঁচ হাজার ফিরিশ্‌তা দ্বারা তাদের সাহায্যের জন্য আসবে। এই সংখ্যাকে বেশি করে দেখিয়েছেন যেন তাদের জন্য সুসংবাদের কারণ হয়, যদিও ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে একজন ফিরিশ্‌তাই আপন প্রভুর নির্দেশে পৃথিবী ওলটপালট করে দিতে পারে। এজন্য পাঁচ হাজার তো নয়ই বরং পাঁচ জনেরও প্রয়োজন নেই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা মহান সাহায্য প্রদর্শন করতে চেয়েছেন, তাই তিনি এমন শব্দ বেছে নেন যা দ্বারা সাহায্যকারীদের আধিক্য প্রকাশ পায় এবং এটিই বুঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি বদরের বিজয়ের পর মু'মিনদের এ সংবাদ প্রদান করেন, ফিরিশ্‌তাদের সংখ্যা বাহ্যিক শব্দকেন্দ্রিক ছিল না বরং এর ব্যাখ্যা কেবল মহান আল্লাহ্ তা'লাই সর্বাপেক্ষা ভালো জানেন। আল্লাহ্ তা'লা এমনটি এজন্য করেন যাতে এ সুসংবাদের মাধ্যমে তাদের হৃদয় প্রশান্ত হয় এবং তারা সুধারণা ও আশায় বুক বাঁধতে পারে।

মুশরিকদের পরাজয় বরণ সম্পর্কে লেখা আছে, কিছুক্ষণ পর সর্বমুখী যুদ্ধ আরম্ভ হলে মুশরিক বাহিনীতে ব্যর্থতা ও অস্থিরতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে যায়। মুসলমানদের প্রবল আক্রমণের সামনে তাদের সারি ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করে। যুদ্ধের ফলাফল খুব দূরে ছিল না যেমনটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। মুশরিকদের বাহিনী বিশৃংখলভাবে পিছু হটে এবং তারা

পালাতে থাকে। মুসলমানরা মারকাট এবং ধরপাকড়ের মাধ্যমে তাদের পিছুধাওয়া করে। এক পর্যায়ে তারা চরমভাবে পরাজিত হয়।

অতঃপর একস্থানে লেখা আছে, এই যুদ্ধ মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় এবং মুসলমানদের প্রকাশ্য বিজয়ে পর্যবসিত হয়। এতে চৌদ্দজন মুসলমান শহীদ হন– ছয়জন ছিল মুহাজিরদের মধ্য থেকে এবং আটজন আনসারের মধ্য থেকে। পক্ষান্তরে মুশরিকদের ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাদের সত্তরজন মারা যায় এবং সত্তরজনকে বন্দি করা হয় যাদের অধিকাংশই নেতা, সর্দার এবং বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিল।

যেমনটি বলা হয়েছে, বদরের যুদ্ধে মোট চৌদ্দজন মুসলমান শাহাদত বরণ করেছেন। তাদের মধ্যে ছয়জন মুহাজির এবং আটজন আনসারের মধ্য থেকে ছিলেন। শাহাদত বরণকারী মুহাজির সাহাবীরা হলেন ১. হযরত উবায়দা বিন হারেস বিন মুত্তালিব (রা.), ২. হযরত উমায়ের বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), ৩. যুশ-শিমালাইন অর্থাৎ হযরত উমায়ের বিন আমর ও ৪. হযরত আকেল বিন বুকায়ের (রা.), ৫. হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস মেহযা এবং ৬. হযরত সাফওয়ান বিন বায়যা (রা.)। আর আনসাররা হলেন– ৭. হযরত সা'দ বিন খায়সামা (রা.), ৮. হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযির (রা.), ৯. হযরত ইয়াযীদ বিন হারেস (রা.), ১০. হযরত উমায়ের বিন হুমাম (রা.), ১১. হযরত রাফে' বিন মুআল্লা (রা.), ১২. হযরত হারেসা বিন সুরাকা (রা.)।

মুশরিকদের মোট সত্তরজন মারা গিয়েছিল, যাদের বেশিরভাগই কুরাইশ-নেতা ছিল। কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ও নিহত নামিদামি ব্যক্তির নাম হলো, হানযালা বিন আবু সুফিয়ান, হারেস বিন হাযরামি, আহমার বিন হাযরামি, উবায়েদ বিন সাঈদ বিন আস, আস বিন সাঈদ বিন আস, উকবা বিন আবি মুআয়েত, উতবা বিন রবীয়্যা, শায়বা বিন রবীয়্যা, ওয়ালীদ বিন উতবা বিন রবীয়্যা, হারেস বিন আমের আবুল বাখতারী, আস বিন হিশাম, নাযার বিন হারেস, আবুল আস বিন কায়েস, উমাইয়্যা বিন আস বিন হিশাম-এর নাম দু'বার এসেছে না-কি দু'জন পৃথক ব্যক্তি। আবুল আস বিন কায়েস, উমাইয়া বিন খালাফ, আবু জাহল যার নাম আমর বিন হিশাম ছিল। তাদের অধিকাংশই মক্কায় মুসলমানসহ মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত। এ বিষয়ের অবশিষ্টাংশ আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

কিছু দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। নির্যাতিতদের সাহায্য করুন। তাদেরকে এমন নেতৃত্ব কিংবা পথপ্রদর্শক দান করুন যারা তাদের অধিকার আদায় করবে, তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে এবং তাদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে পরিত্রাণ দেয়ার চেষ্টা করবে। বর্তমানে তারা চরম নির্যাতিত এবং মনে হয় তাদের দেখাশোনার কেউ নেই। তাদের পথ দেখানোর কেউ নেই। মুসলমানরা যদি এক হয়ে যায় তবে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। একইভাবে সুইডেনে এবং অন্য কিছু দেশেও বাক স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে দুষ্কর্মকারীরা অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে আর তারা এই অজুহাতে মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে খেলে, প্রতিদিন এমন কোনো না কোনো আচরণ করে যা মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত হানে। অত্যন্ত নোংরা আচরণ করে থাকে– পবিত্র কুরআনের অবমাননা করে কিংবা মহানবী (সা.) সম্পর্কে অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে। আল্লাহ্ তা'লা-ই তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন। এক্ষেত্রেও মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের দোষ রয়েছে, যাদের বিভেদের কারণে ইসলামবিরোধী শক্তিসমূহ এ ধরনের অন্যায় আচরণ করে থাকে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া যদি ব্যক্ত হয় তবে তাও সাময়িক হবে এবং

এমন আচরণ করবে যার কোনো প্রভাব থাকবে না। অতএব মুসলমান নেতাদের এবং উম্মতের জন্য অনেক দোয়া করুন। এর অনেক বেশি প্রয়োজন। ফ্রান্সে যে পরিস্থিতি বিরাজমান সেখানেও মুসলমানদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করা হচ্ছে আর এর বিপরীতে মুসলমানদের কিংবা অন্যদের সাথে মিলিত হয়ে যে প্রতিক্রিয়া দেখানো হচ্ছে তাও ভুল। ভাঙচুর করে কোন লাভ নেই। মুসলমানদের নিজেদের আমল ইসলামী শিক্ষাসম্মত করতে হবে। মুসলমানদের কথা ও কাজ যখন ইসলামী শিক্ষানুযায়ী হবে তখনই সফলতা লাভ হবে।

যাহোক, আমরা তো কেবল দোয়া-ই করতে পারি। বিশেষত, মুসলমান-বিশ্বের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র-বিশ্বের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে সুরক্ষিত রাখেন আর পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশও সৃষ্টি হয়। সবাই যেন একে অপরের অধিকার প্রদান করার গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, নতুবা বিশ্ব যেদিকে এগুচ্ছে, আমি বহুবার বলেছি যে, বিরাট ধ্বংসযজ্ঞের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা রহম করুন।

একইভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। ফ্রান্সে বাহ্যত অনেক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছে এবং মনে করা হচ্ছে, যে ছেলেটিকে হত্যা করা হয়েছে তার পক্ষে অনেক কাজ হচ্ছে কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সেখানকার জনসাধারণের আচরণ ভিন্ন। শুনেছি তারা দু'জনের জন্যই তহবিল সংগ্রহ করেছে । অর্থাৎ সেই পুলিশের জন্যও যাকে ধরা হয়েছে এবং সেই ছেলের জন্যও যাকে হত্যা করা হয়েছে। ছেলেটির জন্য সংগ্রীহিত হয়েছে মাত্র দুই লাখ ইউরো এবং পুলিশের জন্য এক মিলিয়নের অধিক অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, আমরা তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করব। সরকারও তার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করছে এবং তাকে সাহায্য করছে। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন, সেসব লোককে ন্যায়ের পথে চলার সামর্থ্য দিন এবং মুসলমানদের একজোট হবার তৌফিক দান করুন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)